بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮ এপ্রিল, ২০২৩ মোতাবেক ২৮ শাহাদাত, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

কেউ কেউ আমাকে লিখেন এবং নিজের কথার সপক্ষে জোরালো যুক্তি দেয়ারও চেষ্টা করেন যে, পাকিস্তানে অথবা অন্যান্য স্থানে জামা'তের যে অবস্থা বিরাজমান তাতে আমাদের শুধুমাত্র ধৈর্যধারণের পরিবর্তে কিছু প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত, ধৈর্য অনেক দেখানো হয়েছে। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দৃষ্টান্ত দেয়ার চেষ্টা করেন যে, তাঁর যুগে জামা'ত এভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, আর তিনি কোনো কোনো স্থানে জামা'তকে প্রতিক্রিয়া দেখানোর অনুমতি দিয়েছেন। এগুলো একেবারে ভুল কথা যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর প্রতি আরোপ করা হয়। এ বিষয়গুলোকে অবশ্যই ভুল বোঝা হয়েছে। কিছু ঘটনা হয়ত সামনে এসেছে, কেউ হয়ত পড়ে থাকবে কিন্তু ভুল বুঝেছে। অবশ্য তিনি আইনের গণ্ডিতে থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এমন নয় যে, চিন্তা-ভাবনা না করেই (তিনি) নৈরাজ্যসৃষ্টিকারীদের মিছিলের ন্যায় মিছিল বের করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এছাড়া কোথাও যদি কোনো প্রকার প্রতিবাদ করা হয়ে থাকে তা যুগ খলীফার অনুমতি সাপেক্ষে হয়েছিল। এমন নয় যে, প্রত্যেক কর্মকর্তা ইচ্ছামতো নিজের লোকদের জড়ো করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা শুরু করে দেবে। যাহোক, দেশবিভাগের পূর্বে, যখন ভারতে ইংরেজদের শাসন ছিল, কতিপয় ইংরেজ কর্মকর্তা এবং আমাদের বিরোধী কর্মকর্তারা বহুবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বক্তৃতাসমূহকে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য আখ্যায়িত করার অথবা এমন রূপ দান করার চেষ্টা করেছে, যার ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেকবার তারা এজন্য ব্যর্থ হতো কেননা, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিরুদ্ধবাদী এবং সরকারী কর্মকর্তাদেরকে তাদের স্বরূপ দেখিয়ে শেষের দিকে সর্বদা জামা'তকে বলতেন, নবীদের জামা'তের কাজ হলো ধৈর্যধারণ ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। আর এ কথা তৎকালীন কর্মকর্তারাও স্বীকার করেছে যে, বক্তৃতা চলাকালীন যখন আমরা মনে করতাম যে, আজ ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ আসবে, বিদ্রোহ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার ধারা আরোপ করে আমরা গ্রেফতার করার চেষ্টা করব, কিন্তু যখন বক্তৃতা শেষ হতো তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে (তিনি) জামা'তকে উপদেশ দিতেন এবং সেসব কাজ করতে বারণ করতেন যেগুলো আইনের গণ্ডি বহির্ভূত ছিল। এভাবে সেসব বিরোধী কর্মকর্তার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যেত। আর তিনি (রা.) এমন কোনো কথা বলবেন যা ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী হবে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার বিরোধী হবে– তা কীভাবে সম্ভপর হতে পারে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অসংখ্য স্থানে জামা'তকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছেন, দোয়া করার উপদেশ দিয়েছেন আর স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যাদের পা দুর্বল এবং আমার সাথে এসব কণ্টকাকীর্ণ ও পাথুরে পথে চলতে পারে না আর ধৈর্যধারণের শক্তি রাখে না, তারা চাইলে আমাকে পরিত্যাগ করতে পারে। এই ধৈর্যই তো বিশ্বব্যাপী জামা'তকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।

অনেক রাজনীতিবিদ এবং সংবাদ মাধ্যম আমাকেও জিজ্ঞেস করে আর অধিকাংশ সময়ে আমি তাদের এই উত্তরই দেই যে, যারা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে এবং অত্যাচার

চালাচ্ছে তাদের মধ্য থেকেই আমরা আহমদীরা এসেছি এবং এসব নিপীড়ন সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তাদের মাঝ থেকেই লোকেরা (আহমদীয়াতে) আসছে। আমাদের স্বভাব প্রকৃতিও তাদের মতোই ছিল। আমরাও তাদের মতো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারি, কিন্তু আমরা যুগ ইমামকে মেনেছি, যিনি শান্তি বজায় রাখার এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা ধৈর্য প্রদর্শন করবে। তবে, আইনের গণ্ডিতে থেকে নিজের অধিকার আদায়ের জন্য যতটুকু চেষ্টা করার তা করতে পারো। কখনো কখনো কোনো কোনো বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বিষয় আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দেয়ারও উপদেশ দিয়েছেন আর বলেছেন, খোদা তা'লা স্বয়ং আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন এবং তিনি এসেছেন। অতএব স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এটি নবীদের ইতিহাস আর এটিই আমাদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা যে, আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। যাহোক, এই উত্তরে মানুষ হতবাকও হয় আর সাধুবাদও জানায় যে, এটিই শান্তিপ্রিয় লোকদের যথার্থ প্রতিক্রিয়া।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বরাত দিয়ে যারা কথা বলে তাদের জন্য তাঁরই খুতবার আলোকে আরও স্পষ্ট করে কিছু কথা বর্ণনা করতে চাই। আলোচ্য খুতবায় তিনি (রা.) অত্যন্ত বিশদভাবে ধৈর্যের অর্থ বর্ণনা করেছেন, আলোকপাত করেছেন, বরং এরপর ধারাবাহিকভাবে উন্নত নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কিত খুতবা দিতে আরম্ভ করেন আর ধৈর্যের বিষয়বস্তুর সাথে একে সম্পৃক্ত করেছেন। যাহোক, আলোচ্য খুতবাকে কাজে লাগিয়ে, কিছু কথা বলব। একইভাবে বিভিন্ন সময়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ধৈর্য সম্পর্কিত যেসব নির্দেশনা প্রদান করেছেন সেসব উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ধৈর্যকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আখ্যায়িত করে বলেন, **এটি নবীদের জামা'তের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধানতম দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম, যা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না আর জগৎকে নিজের পিছনে চলতে বাধ্য করতে পারে না। আর এমন কোনো জামা'ত বা দল অতিবাহিত হয়নি, যারা এই কর্তব্য পালন না করেই সফলতার মুখ দেখতে পেয়েছে।** ধৈর্য দু'ধরনের হয়ে থাকে। তিনি (রা.) এটি স্পষ্টও করেছেন, তিনি তাঁর তফসীরে কোনো কোনো আয়াতের তফসীরেও এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এক প্রকার ধৈর্য হলো, মানুষের কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া দেখানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে ধৈর্যধারণ করে। আর দ্বিতীয়ত, সেই সময়ের ধৈর্য যখন তার মোকাবিলা করার বা প্রতিক্রিয়া দেখানোর কোনো শক্তিই থাকে না, সেই ধৈর্য (মূলত) অপারগতার ধৈর্য। শক্তি বা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ধৈর্যের অর্থ হলো, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলাকারীদের বা অত্যাচারীদের প্রতিউত্তর না দেওয়া। বিরোধীরা যেভাবে আচরণ করছে (ঠিক) সেভাবে প্রতিক্রিয়া না দেখানো এবং আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে চূড়ান্ত ধৈর্য প্রদর্শন করা। আর (প্রতিরোধের) সামর্থ্য না থাকার কারণে ধৈর্য ধারণের অর্থ হলো, দৈবদুর্বিপাক বা বিপদাপদের সময় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্যধারণ করা। যাহোক উর্দূতে ধৈর্য বলতে বুঝায় হা-হুতাশ না করে চুপ থাকা। কিন্তু আরবীতে এর অর্থ অনেক ব্যাপক। আমরা যখন আরবী অর্থ পর্যালোচনা করি তখন সঠিকভাবে বুঝতে পারি যে, ধৈর্যের প্রকৃত অর্থ বা মর্ম কী আর একজন মু'মিনের কীরূপ ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন স্থানে ধৈর্যের যে উপদেশ দিয়েছেন আর তাঁর শিক্ষা দৃষ্টিপটে রেখে 'সব্‌র' শব্দের প্রকৃত অর্থ যা অভিধানে বর্ণিত হয়েছে, সে অনুসারে 'সব্‌র' শব্দের তিনটি অর্থ আছে। প্রথমত, পাপ পরিহার করা আর নিজেকে তা

থেকে বিরত রাখা। দ্বিতীয়ত, অবিচলতার সাথে সৎকর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর তৃতীয় অর্থ হলো, হা-হুতাশ থেকে বিরত থাকা। সাধারণত উর্দূতে এসব অর্থই করা হয়।

অতএব, প্রথম অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে (ধৈর্য হলো), মানুষের নিয়মিত ও অবিচলতার সাথে সেসব পাপের মোকাবিলা করা, যা তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করছে, এরপর সেসব পাপের মোকাবিলার জন্যও প্রস্তুত থাকা, যা ভবিষ্যতে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। সুতরাং ধৈর্য শুধু এতটুকুই নয় যে, (মৌখিকভাবে) বলা হবে, আমরা অনেক বড় ধৈর্যশীল আর এরপর হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। বরং অবিচলতার সাথে নিজের অভ্যন্তরীণ (দোষ-ত্রুটি) পরিষ্কার করাই হলো প্রকৃত ধৈর্য। যারা এমন মানুষ, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাহায্যের জন্য এমন স্থান থেকে আসেন যার কল্পনাও করা যায় না। বিরুদ্ধবাদীরা চায় আমরা যেন ধৈর্যের আঁচল হাতছাড়া করি এবং তাদের মতো আচরণ করি, যাতে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একথা বলেন যে, তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে, আত্মবিশ্লেষণ করে দেখবে যে, তোমরা যা বলছো তা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশসম্মত কি-না? আর সে মোতাবেক কাজ করতে হবে।

('সবর' এর) দ্বিতীয় অর্থের ব্যাখ্যা হলো, মানুষ যেন অবিচলতার সাথে সেই পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে যা সে অর্জন করেছে আর সেসব পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করা যা সে এখনও অর্জন করতে পারে নি। এটিও এক প্রকার ধৈর্য। এটিও প্রকৃত অর্থে একজন মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন করে। আর জানা কথা যে, এই নৈকট্য বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার পাশাপাশি দোয়ার মাধ্যমে লাভ হতে পারে, যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এক জায়গায় বলেন, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (সূরা আল্ বাকারা: ৪৬) অর্থাৎ **আর ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর অবশ্যই বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের জন্য এ বিষয়টি কঠিন**। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে এবং যারা বিনয়ী তারাই এমন ধৈর্য প্রদর্শন করতে পারে (এবং) যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে। এরপর অন্যত্র বলেছেন, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (সূরা আর্ রা'দ: ২৩) আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির খাতিরে ধৈর্যধারণ করেছে এবং সুন্দরভাবে নামায আদায় করেছে আর আমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যেও আমাদের পথে ব্যয় করেছে আর পুণ্যের মাধ্যমে পাপকে দূরীভূত করতে থাকে তাদেরই জন্য পারলৌকিক শুভ পরিণাম নির্ধারিত রয়েছে। এ পৃথিবী তো ক্ষণস্থায়ী, এখানে তো বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে (কিন্তু) পারলৌকিক গৃহ, যা সর্বশেষ বাসস্থান তা এমন লোকেরা লাভ করে যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি কামনা করে।

অতএব, ধৈর্য হলো অবিচলতা, বিনয় এবং দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি কামনার নাম। আর এমনটি তখনই হবে যখন আমরা নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষানুযায়ী সাজাবো এবং নিজেদের জীবন সে অনুসারে অতিবাহিত করব। আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনই হবে আমাদের উদ্দেশ্য। আর যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, হা-হুতাশ না করাও ধৈর্যের একটি অর্থ। বাহ্যিক বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি অথবা আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি বা অন্য কোনো বিপদ আসলে, বিচলিত না হওয়া আর অভিযোগের সুরে হা-হুতাশ না করা যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সাথে এটি কী করলেন!– এগুলো অধৈর্যের লক্ষণ। আল্লাহ্ তা'লার

বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আচরণ। সর্বদা মনোভাব এটি হওয়া উচিত যে, যা কিছু আমার কাছে আছে তা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পুরস্কার স্বরূপ, আজ আল্লাহ্ তা'লা নিয়ে থাকলে কাল আরও দিবেন। অতএব এমন মানসিকতার অধিকারীরাই সত্যিকার মু'মিন। আর এমন ধৈর্যশীলরাই আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে প্রকৃত ধৈর্যধারণকারী।

অতএব এ হলো ধৈর্যের তিনটি অর্থ, কিন্তু সর্বদা এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো দুর্বলতার কারণে যেন ধৈর্যধারণ না করা হয়, জাগতিক কোনো ভয়ের কারণে যেন তা না হয়, বরং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই যেন তা হয়, তবেই সেটি প্রকৃত ধৈর্য যা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আকৃষ্ট করে। যদি কোনো ব্যক্তি ঊর্ধ্বতন কর্মকতার সামনে বা বাদশাহ্র সম্মুখে তার অত্যাচারের মুখে কেবলমাত্র এই কারণে নীরব থাকে যে, সে আল্লাহ্ তা'লার আদেশে ধৈর্যধারণ করছে তবে এটিই প্রকৃত ধৈর্য। আর তা যদি জীবননাশের ভয়ে হয়ে থাকে, তবে এটি সঠিক নয়। আমরা যে ধৈর্যধারণের নসীহত করি তা কেবলমাত্র এ কারণে যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ। যদি প্রতিশোধই নিতে হয় তবে বহু আহমদী এই ক্ষোভ নিয়ে বসে থাকবে যে, জীবনের পরোয়া করি না, আমরা প্রতিশোধ নিয়ে একবার হলেও এই অত্যাচারীদের শায়েস্তা করতে পারি আর শায়েস্তা করে ছাড়ব। কিন্তু আমরা এমনটি করব না। এটি সেই শিক্ষার পরিপন্থি যা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে আর আমরা এমন কার্যকলাপকে ঘৃণা করি, কেননা এটি নবীদের জামা'তের জন্য শোভনীয় নয়। আর আমরা বয়আতের অঙ্গীকারে মানবজাতিকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখারও অঙ্গীকার করেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে কঠোরভাবে এসকল বিষয়ে বারণ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ধৈর্য ধারণের বিষয়ে একটি দিক এটিও বলেছেন যে, স্মরণ রেখো! তোমাদের আমলের মাধ্যমে ধৈর্য ও আত্মসম্মানহীনতার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরুপ, যদি কোনো ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনে কারো কাছ থেকে ঋণ করতে যায় আর সেই ব্যক্তি তাকে ভালোমন্দ কথা শুনায় আর বেহায়া ও নির্লজ্জ বলে চরম অপমান করে আর যাচনাকারী হাসি দিয়ে তার কথা এড়িয়ে যায় এবং ভাবে যে, এখন যেহেতু আমি সাহায্যের মুখাপেক্ষী তাই তার গালিগালাজও আমার হজম করে নিতে হবে, তবে এটি নির্লজ্জতা ও আত্মসম্মানহীনতা। কিন্তু অনেক সময় জাতীয় ও ধর্মীয় স্বার্থে ধৈর্যধারণ করতে হয় আর নীরবও থাকতে হয়। আর এই ধৈর্য ব্যক্তিগত স্বার্থে হয় না। এ কারণে এটিই প্রকৃত ধৈর্যধারণ আর তা আত্মসম্মানহীনতা নয়। উদাহরণস্বরুপ এমন কোনো ক্ষেত্রে, যেখানে তার প্রতিশোধ গ্রহণের কারণে তার জাতির ওপর কোনো বিপদ আপতিত হতে পারে সেখানে যদি সে আক্রমণ করে আর ধৈর্যধারণ না করে তবে তাকে নির্বোধ বলা হবে, কেননা এভাবে সে নিজ জাতির ক্ষতি করে। কাজেই সে যখন নিজ জাতির কল্যাণার্থে প্রতিশোধ গ্রহণ করে না অথবা পৃথিবীকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে ধৈর্যধারণ করে, তখন তার এই ধৈর্য প্রকৃত ধৈর্য আখ্যায়িত হয়।

অতএব এই বিষয়টি আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। কতক লোক খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, (আমাদের) অমুক লোককে পুলিশ আটক করেছে, তাই জনসভা করো আর মিছিল বের করো। এগুলো সবই ভুল কাজ। শত্রুরা চায় যেন আমরা এমন আচরণ করি, যাতে তারা সেসব কর্মকর্তার সাথে মিলিত হয়ে যারা পূর্বেই আমাদের বিরোধী, আমাদের বিরুদ্ধে অধিক কঠোরতা প্রদর্শন করতে পারে, সেসব আহমদীকে ধরতে পারে এবং আমাদের ব্যাবস্থাপনার ওপর আরও বিধিনিষেধ আরোপের ষড়যন্ত্র করতে পারে অথবা সরকারের কাছে

এর দাবি করতে পারে, যেখানেকিনা সরকারও বা অধিকাংশ কর্মকর্তাও আমাদের বিরোধী। এখন যখনকিনা সরকারের কতক কর্মকর্তাও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে আর এমন পরিস্থিতিতে মুনাফেকরাও (যেখানে) সুযোগ নিয়ে থাকে, এমনসব উপলক্ষ্যে সেখানে যখন এরূপ প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে তখন পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। আমরাও প্রত্যক্ষ করেছি আর হবেও এবং আমাদের অভিজ্ঞতাও এটি যে, এমন পরিস্থিতিতে যখন এমন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করা হয়েছে তখন পরিস্থিতির অবনতিও হয়েছে। এমন কতিপয় ঘটনা জামা'তের ইতিহাসে রয়েছে যেখানে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই বেশি হয়েছে। আর যখন ধৈর্যধারণ করে পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আইনগত প্রচেষ্টা করা হয়েছে তখন সকল স্থানে শতভাগ না হলেও বহু স্থানে এতে লাভ হয়েছে। এই কথা আমরা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, আমরাও এই জাতিরই সদস্য, আর ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া আমাদের মাধ্যমেও প্রদর্শিত হতে পারে বা আমাদের মধ্য থেকে কারো দ্বারা প্রদর্শিত হতে পারে, কিন্তু আমরা এমনটি করি না। এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি আর ধীরে ধীরে কতক কর্মকর্তার হৃদয়ে এর ইতিবাচক প্রভাবও পড়ে এবং পড়েছে আর এমনসব ঘটনার অভিজ্ঞতাও আমাদের হয়েছে। আমরাও যদি গালমন্দের উত্তরে গালমন্দ করি ও মারধোরের প্রত্যুত্তরে মারধোর করি তাহলে যারা যেরে-তবলীগ রয়েছেন তাদের ওপর ইতিবাচক প্রভাবের পরিবর্তে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তখন তারা এই কথা বলার অধিকার রাখবে যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) এসে তাদের মাঝে কী এমন ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করেছেন যে, আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবো? তাদের বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও বিরোধীদের প্রতি তেমনই। নবীদের এবং তাঁদের জামা'তের সুন্নত বা রীতি হলো, তারা ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে থাকে যেমনটি আল্লাহ্ তা'লারও নির্দেশ এবং রসূল (সা.)-এরও নির্দেশ রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও আমাদেরকে এই শিক্ষাই প্রদান করেছেন। অতএব আমাদের সর্বদা একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, জামা'তের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদেরকে সাময়িক ও ছোটোখাটো কষ্ট ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হবে, বরং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (আ.) তো এক উপলক্ষ্যে এটিও বলেছেন যে, আমাদের কখনো কখনো আইনের আশ্রয় নেয়ারও প্রয়োজন নেই। ধৈর্য সহকারে কঠোরতা সহ্য করা উচিত। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একথা বর্ণনা করতে গিয়ে যে, মানুষ বলতে পারে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও তাঁর পুস্তকসমূহে কতক কঠিন শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তাই আমরাও এমনটি করতে পারি, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এমন লোকদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর নবীদের মর্যাদা ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমনটি আমরা জাগতিক বিষয়াদিতেও দেখি যে, একজন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা জজ যদি অপরাধীকে চোর আখ্যায়িত করে তবে সেটি হলো তার কর্মগণ্ডি এবং তার (এরূপ করার) অধিকার রয়েছে আর সেটির ভিত্তিতে সে তাকে শাস্তি দিয়ে থাকে ও তার সংশোধনের চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু এটি সবার কাজ নয় যে, অন্যদেরকে চোর কিংবা অপরাধী বলে বেড়াবে। আর যদি সে এমন বলে তবে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যদি মানুষের দুর্বলতা প্রকাশ করে সেগুলো চিহ্নিত করে থাকেন তবে সেটি তাদের সংশোধনের জন্য এবং তাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষকে বাঁচাতে এমনটি করেছেন। কিন্তু তিনি (আ.) নিজের সম্পর্কে বলেন,

گالیاں سن کر دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو

رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے

[তাদের গালমন্দের বিপরীতে আমি তাদের জন্য দোয়া করে থাকি; আমার মাঝে দয়া উদ্বেলিত আর ক্রোধকে আমরা দমন করেছি– অনুবাদক]

আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, অন্যদের কঠোরতাকে ধৈর্য সহকারে বরণ ও সহ্য করো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উদাহরণ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যার তিনি সম্মুখীন হয়েছেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গাড়িতে বসে লাহোরের (কোনো স্থানে) যাচ্ছিলেন। তখন শহরের দুর্বৃত্তরা তাঁর ওপর পাথর মারতে থাকে যা তাঁর গাড়িতে এসে পড়তে থাকে। সেটি ঘোড়ার আবদ্ধ গাড়ি ছিল। কিন্তু তারা যা করছিল (সে কারণে) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কপালে চিড়ও ধরেনি। কিছু পাথর জানালা ভেঙে ভেতরেও এসে পড়ত। আর এরই প্রভাব ছিল যে, তাদেরই মধ্য থেকে শত শত মানুষ এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাসদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত, অর্থাৎ তাঁর (আ.) যে ধৈর্য ছিল (তার কারণে)। অতএব এই আদর্শই আমাদের আজও প্রদর্শন করতে হবে। কেউ যদি ব্যক্তিস্বার্থ এবং হৃদয়ের ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণে বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, তবে শর্ত হলো, আমাদের ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে কার্য সাধন। মহানবী (সা.)-এর যুগে বহু লোক তাঁর এবং সাহাবীদের ধৈর্য ও মনোবল দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল আর বর্তমান যুগেও এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই, যেমনটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও মানুষ তাঁর ধৈর্য দেখে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আজও আমরা এমনটি দেখতে পাই। বহু মানুষের চিঠি আমার কাছে এখনও বিভিন্ন দেশ থেকে এসে থাকে যারা কি-না জামা'তের এই আদর্শ দেখেই জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জামা'তের সদস্যদের ধৈর্যধারণের উপদেশ প্রদান করে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ধৈর্য একান্ত মূল্যবান বস্তু। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণকারী হয়ে থাকে এবং রাগান্বিত হয়ে কথা বলে না তার বক্তব্য তার নিজের হয় না, বরং খোদা তা'আলা তাকে দিয়ে বক্তৃতা করান। জামা'তের সদস্যদের উচিত ধৈর্য অবলম্বন করা এবং বিরোধীদের কঠোরতার বিপরীতে কঠোরতা প্রদর্শন না করা আর গালির বিপরীতে গালি না দেওয়া। যে ব্যক্তি আমাদের অস্বীকারকারী তার জন্য আবশ্যক নয় যে, সে ভদ্রভাবে কথা বলবে। এটা আবশ্যক নয় যে, সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম সম্মানের সাথে উচ্চারণ করবে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনীতেও এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ধৈর্যের মতো কোনো জিনিস নেই। কিন্তু ধৈর্যধারণ করা অনেক কঠিন কাজ। আল্লাহ্ তা'লা তার সাহায্য করেন যে ধৈর্য অবলম্বন করে।

অতঃপর জামা'তের অবস্থার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে এবং নবাগতদের সমস্যাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে আর ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তের সদস্যদের জন্যও সেরূপ বিপদাবলী রয়েছে যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে মুসলমানদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যেমন যখন কোনো ব্যক্তি এই জামা'তে প্রবেশ করে তখন নুতন ও সর্বপ্রথম সমস্যা যা দেখা দেয় তাহলো সাথে সাথেই (তার) বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও পরিবার-পরিজন পৃথক হয়ে যায়। এমনকি কখনো কখনো পিতা-মাতা ও ভাই-বোনেরাও তার শত্রু হয়ে যায়। আসসালামু আলাইকুম বলাও পছন্দ করে না এবং জানাযা পড়তে চায়

না। এরূপ বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি (আ.) বলেন, আমি জানি যে, কতিপয় দুর্বল প্রকৃতির ব্যক্তিও থেকে থাকে এবং এরূপ বিপদে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে, কিন্তু স্মরণ রেখো যে, এরূপ বিপদাপদ আশাও আবশ্যক। তোমরা নবী-রসূলদের চেয়ে বেশি সম্মানিত নও। তাদের ওপরও এরূপ কষ্ট ও বিপদাপদ এসেছে আর তা এজন্য আসে যেন খোদা তা'লার প্রতি ঈমান মজবুত হয়। অর্থাৎ ঈমানের দৃঢ়তার জন্য এসব বিপদাপদ এসে থাকে, এবং যেন পবিত্র পরিবর্তন সাধনের সুযোগ লাভ হয়। অবিরত দোয়া করতে থাকো। অতএব এটি আবশ্যকীয় যেন তোমরা নবী ও রসূলদের অনুসরণ করো এবং ধৈর্যের পথ অবলম্বন করো। তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। সত্য গ্রহণের কারণে যে বন্ধু তোমাকে পরিত্যাগ করে সে প্রকৃত বন্ধু নয়, নতুবা তার উচিৎ ছিল তোমার সাথে থাকা। যারা শুধুমাত্র এই কারণে তোমাদের পরিত্যাগ করে ও তোমাদের কাছ থেকে পৃথক হয় যে, তোমরা খোদা তা'আলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছো, তোমাদের উচিত তাদের সাথে দাঙ্গা-ফাসাদ না করা, বরং তাদের জন্য নিভৃতে দোয়া করা। শুধু এটিই নয় যে, লড়াই করা যাবে না, বরং তাদের জন্য দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সেই অন্তর্দৃষ্টি ও তত্ত্বজ্ঞান দান করেন যা তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের দান করেছেন। অতএব তিনি কেবল দাঙ্গা-ফাসাদ করতেই নিষেধ করেন নি, বরং দোয়া করতেও বলেছেন। হৃদয়ে সহানুভূতি লালন করতে বলেছেন যেন তারাও সত্যকে চিনতে পারে। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা নিজ পবিত্র আদর্শ ও উত্তম আচার-আচরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাও যে, তোমরা উত্তম পথ অবলম্বন করেছো। দেখো! আমি তোমাদের বারংবার এই পথনির্দেশনা দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি যে, সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামার স্থান এড়িয়ে চলো এবং গালি শ্রবণ করেও ধৈর্যধারণ করো, মন্দের উত্তর পুণ্যের মাধ্যমে দাও। আর কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইলে এমন স্থান থেকে তোমাদের সরে যাওয়াই উত্তম। কুরআন শরীফের আদেশও তা-ই যে, সেখান থেকে চলে যাও এবং নম্রতার সাথে উত্তর দাও। বহুবার এমন হয় যে, এক ব্যক্তি একান্ত উত্তেজিত হয়ে বিরোধিতা করে আর বিরোধিতায় সেই পথ অবলম্বন করে যা নৈরাজ্যের পথ। এমনভাবে বিরোধিতা করে যার ফলে নৈরাজ্য দেখা দেয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। যার ফলে শ্রোতাদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, কিন্তু যখন বিপরীত দিক থেকে নম্র উত্তর আসে এবং গালির প্রতিউত্তর দেয়া হয় না তখন তারা নিজেরাই লজ্জিত হয়। এটিও সত্য যে, বর্তমান যুগে বহু মানুষ নির্লজ্জ, উপরন্তু অত্যাচারও করে, কিন্তু এমনও অনেকে আছে যারা লজ্জিত হয়। আর তারা নিজেদের কার্যকলাপে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। সাম্প্রতিক খুতবায় আমি বাংলাদেশের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে একটি উদাহরণও দিয়েছিলাম আর তাতে বলেছিলাম যে, আমাদের এক ছেলে যখন দাঙ্গাবাজদের এক ছেলেকে বলেছিল, তুমি কি জানো, তুমি কী করছো আর কার নামে করছো? তখন সে বুঝতে পারে, ফলে সে (তার হাতের) ইটটি পিছনে ফেলে দেয় বা যে পাথরটি মারার জন্য উঠিয়েছিল তা নীচে ফেলে দেয়। তিনি (আ.) বলেন, আমি সত্য সত্যই বলছি, ধৈর্যকে হাতছাড়া কোরো না। ধৈর্য এমন এক অস্ত্র যে, কামান দিয়ে যে কাজ সমাধা হয় না তা-ও ধৈর্যের দ্বারা সম্ভব। ধৈর্যই (মানুষের) হৃদয় জয় করে। নিশ্চিতভাবে (একথা) মনে রাখবে যে, যখন আমি শুনি, অমুক ব্যক্তি এই জামা'তভুক্ত হয়েও কারো সাথে ঝগড়া করেছে তখন আমার খুব কষ্ট হয়। এই পন্থাটি আমি মোটেই পছন্দ করি না আর মহান আল্লাহ্ও চান না যে, যেই জামা'ত পৃথিবীতে আদর্শস্থানীয় হবে তারা এমন একটি পথ অবলম্বন করবে যা তাকওয়ার পথ নয়। বরং আমি তোমাদের

বলছি যে, আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়কে এতটা গুরুত্ব দেন যে, কেউ যদি এই জামা'তের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন না করে তাহলে তার মনে রাখা উচিত, সে এই জামা'তভুক্ত নয়। এটি অনেক বড় সতর্কবার্তা! এটি সবসময় আমাদের মনে রাখা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, রাগ হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ এটি হতে পারে যে, আমাকে নোংরা গালি দেয়া হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাকে আজেবাজে ও নোংরা গালমন্দ করলে তোমাদের রাগ হয়। অতএব তিনি (আ.) বলেন, এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র ওপরই ছেড়ে দাও। তোমরা এর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। আমার বিষয়টি আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দাও। এসব গালমন্দ শোনার পরও তোমরা ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করো। তোমরা জানো না যে, এসব লোকের কাছ থেকে আমি কত গালি শুনি! প্রায়ই এমনটি ঘটে যে, অশ্রাব্য গালাগালিতে ভরা চিঠিপত্র আসে, গালিপূর্ণ পোষ্টকার্ড প্রেরণ করা হয়। বেয়ারিং চিঠিপত্র আসে যেগুলোর মাশুলও দিতে হয়। [অর্থাৎ, টিকিট না লাগিয়েই চিঠি পাঠিয়ে দেয়। সেসব ডাকটিকেটের টাকাও দিতে হয়, তারপর পড়তে গেলে তাতে থাকে গালমন্দের স্তুপ।] এমনসব অশ্রাব্য গালি থাকে যে, আমি নিশ্চিতভাবে জানি, কোনো নবীকেও এ ধরনের গালি দেয়া হয়নি আর আমার মনে হয় না যে, আবু জাহলের মাঝেও এ ধরনের গালমন্দ করার উপাদান ছিল। এসব লোক যে ধরনের গালি দেয় তা হয়ত আবু জাহলও দেয়নি। তবুও এসব কিছু শুনতে হয়। আমি যেহেতু ধৈর্যধারণ করি তাই তোমাদেরও ধৈর্য ধরা উচিত। বৃক্ষের চেয়ে শাখার গুরুত্ব বেশি নয়।

নিজের ক্ষেত্রে তিনি পরম ধৈর্যধারণ করতেন। যেমন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও বলেছিলেন যে, ব্যক্তিগত বিষয়ে তিনি পরম পর্যায়ের ধৈর্যশীল ছিলেন। তিনি যদি কঠোরতা করেন [অর্থাৎ লোকেরা যে বলে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কঠোর হয়েছেন] তাহলে এটি সংশোধনের জন্য আর এই অধিকার তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। সবার এই অধিকার নেই। আর যেহেতু অধিকার নেই তাই আমরা যদি এমনটি করি তাহলে সংশোধনের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

তিনি (আ.) বলেন, তারা আর কতদিন গালাগালি করবে। তোমরা দেখবে অবশেষে তারাই ক্লান্ত হয়ে যাবে। তাদের গালমন্দ, তাদের দুষ্কর্ম এবং ষড়যন্ত্র আমাকে মোটেই ক্লান্ত করতে পারবে না। তাই আমরাও ক্লান্ত হবো না। আমি যদি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে না হতাম তাহলে অবশ্যই আমি তাদের গালাগালিতে ভয় পেতাম। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি, খোদা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। তাই এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমি কেন মাথা ঘামাব? এটি কখনোই হতে পারে না। তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো! তাদের গালাগালিতে কার ক্ষতি হয়েছে, তাদের, নাকি আমার? তাদের দল ছোটো হয়েছে আর আমার (দল) বৃদ্ধি পেয়েছে। জামা'ত যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের মধ্যে থেকেই আসছে। এসব গালাগালি যদি কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে তাহলে দুই লাখের অধিক লোকের জামা'ত কীভাবে সৃষ্টি হলো? যে যুগে তিনি এ কথা বলেছেন তখন তিনি (আ.) জামা'তের সদস্য সংখ্যা দুই লাখ বলেছেন। আর আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর প্রতিটি দেশে তাঁর (আ.) আগমনবাণী পৌঁছে গেছে এবং জামা'ত প্রতিষ্ঠিত আছে। এগুলো কি কোনো প্রতিক্রিয়া বা শক্তি প্রদর্শনের ফলে হয়েছে? না! বরং এগুলো ত্যাগ, ধৈর্য এবং দোয়ার ফসল। সুতরাং এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে ধৈর্য প্রদর্শন করে যেতে হবে। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, এরা তো তাদের মধ্য থেকেই এসেছে; নাকি অন্য কোনো স্থান থেকে এসেছে? তারা আমার ওপর

কুফরি ফতোয়া দিয়েছে, কিন্তু সেই কুফরি ফতোয়ার কী প্রভাব পড়েছে? জামা'ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জামা'ত যদি (মানবীয়) পরিকল্পনার অধীনে চালানো হতো তবে অবশ্যই এই ফতোয়ার প্রভাব পড়ত এবং আমার পথে সেই কুফরি ফতোয়া অনেক বড় প্রতিবন্ধক হতো। কিন্তু যে বিষয় খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে সেটিকে পদদলিত করার সাধ্য মানুষের নেই। আমার বিরুদ্ধবাদীরা যেসব ষড়যন্ত্র করে (এর ফলাফল দেখে) ষড়যন্ত্রকারীদের হতাশই হতে হয়। আমি স্পষ্ট করে বলছি, এসব লোক, যারা আমার বিরোধিতা করে (তাদের অবস্থা হলো) তারা যেন প্রবল বেগে ধেয়ে আসা এক বিশাল নদীর সামনে বাধা দেয়ার জন্য নিজেদের হাত রেখে দেয়, আর চায় যে, তার মাধ্যমে পানি থেমে যাক। [নদীর মতো প্রবল বেগে বিশাল জলরাশি ধেয়ে আসছে, এর বিপরীতে নিজেদের হাত পেতে রেখে ভাবে, পানি থেমে যাবে! কিন্তু ফলাফল জানাই আছে, সেটি বাধাগ্রস্ত হওয়া সম্ভব নয়।] এরা এসব গালাগালির মাধ্যমে (এই ধারাকে) থামাতে চায়, কিন্তু স্মরণ রাখবেন, তা কখনোই থামবে না। গালাগালি করা কি ভদ্র মানুষের কাজ? আমার এসব মুসলমানদের কারণে পরিতাপ হয়, এরা কেমন মুসলমান যারা এমন ধৃষ্টতার সাথে মুখ খোলে। [পাকিস্তানে তো তাদের মিছিল থেকে অদ্ভূত সব গালি দেয়া হতে থাকে।] তিনি (আ.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার নামে শপথ করে বলছি, এমন নোংরা গালাগালি তো আমি কখনো কোনো চাড়াল-চামারকেও দিতে শুনিনি যেমনটা আমি এসব তথাকথিত মুসলমানদের কাছে শুনেছি! এরূপ গালাগালির মাধ্যমে এসব লোক নিজেদের স্বরূপই প্রকাশ করে থাকে। [গালাগালির মাধ্যমে কেবল তাদের নিজেদের অবস্থাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, তাদের মনমানসিকতা কেমন, তাদের কর্মকাণ্ড কেমন;] এবং (প্রকারান্তরে) তারা স্বীকার করে নেয় যে, তারা দুষ্কৃতকারী, পাপাচারী লোক। খোদা তা'লা তাদের চোখ খুলে দিন এবং তাদের প্রতি করুনা করুন। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, এমন গালমন্দকারী লোক যদি সংখ্যায় এক কোটিও হয় তারা খোদা তা'লার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এরা মনে করে, কেবল এক পয়সার একটি পোস্টকার্ডই নষ্ট হবে; কিন্তু তারা জানে না, এই আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি আমলনামায়ও কালিমা লিপ্ত হবে। [পোস্টকার্ডে লিখে আমাকে গালাগালি দেয়, এর মাধ্যমে নিজের আমলনামায়ও কালিমা লেপন করতে থাকে।] আমি বুঝতে পারি না যে, তাহলে এভাবে গালাগালি কেন করা হয়? শুধু কি এজন্যই যে, আমি বলি, পবিত্র কুরআনকে পরিত্যাগ কোরো না এবং মহানবী (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন কোরো না? আশ্চর্যের বিষয়! কুরআন শরীফে লেখা আছে যে, হযরত ঈসা মৃত্যু বরণ করেছেন এবং পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না, কিন্তু তারা মানতেই চায় না আর এই কুরআন-বিরোধী বিশ্বাসে অনড় থাকার ব্যাপারেই হঠকারিতা দেখায়! আমি যদি না আসতাম এবং খোদা তা'লা একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠা না করতেন তবে তারা যা খুশি বলতে পারত, কারণ তাদেরকে জাগানোর ও তাদের অবহিত করার মতো কেউ তাদের মাঝে ছিল না। কিন্তু এখন যেহেতু খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন এবং আমিই সেই ব্যক্তি যাকে মহানবী (সা.) 'হাকাম' (অর্থাৎ ন্যায়বিচারক) আখ্যা দিয়েছেন, তাই আমার সিদ্ধান্ত দেয়ার পর তাদের টুঁ শব্দটিও করার অধিকার ছিল না। তাকওয়ার পন্থা তো এটিই ছিল যে, তারা আমার কথা শুনত ও গভীরভাবে প্রণিধান করত আর অস্বীকার করার জন্য তাড়াহুড়ো না করত। আমি সত্য সত্যই বলছি, আমার আগমনের পর তাদের এভাবে মুখ খোলার অধিকার নেই, কারণ আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এসেছি এবং 'হাকাম' হিসেবে এসেছি।

মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে ধৈর্যের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, তার সাথে কেউ পাল্লা দিতেই পারে না– সেটির উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর জাতি বনী ইসরাঈল তাকে (তার দাবি করার) সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নিয়েছিল। এজন্য জাতির পক্ষ তাকে কোনো দুঃখকষ্ট বা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় নি। হযরত মূসা (আ.)-কে তার জাতির পক্ষ থেকে কোনো দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয় নি, বরং তিনি এর সম্মুখীন হয়েছেন ফেরাউনের পক্ষ থেকে। কিন্তু পক্ষান্তরে মহানবী (সা.) তাঁর নিজের জাতির পক্ষ থেকেও সমস্যা ও প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হয়েছেন। এহেন পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.)-এর সফলতাগুলো কত উচ্চ পর্যায়ের বলে প্রমাণিত হয়েছে, যা তাঁর উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। মহানবী (সা.) যখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ও নির্দেশে তবলীগের কাজ শুরু করেন তখন শুরুতেই জাতির লোকদের প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হন। লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) যখন কুরাইশদের আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের সবাইকে ডেকে বলেন, আমি তোমাদের একটি কথা জিজ্ঞেস করছি, তোমরা এর উত্তর দাও। অর্থাৎ আমি যদি তোমাদের বলি, এই পাহাড়ের পেছনে একটি বিশাল বাহিনী অবস্থান নিয়েছে এবং সুযোগ পেলেই তোমাদের হত্যা করার জন্য ওতপেতে বসে আছে; তোমরা তা বিশ্বাস করবে? সবাই সর্বসম্মতিক্রমে বলে, অবশ্যই আমরা এটি মেনে নেব, কেননা আপনি সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত। তারা যখন এই স্বীকারোক্তি দিয়ে দেয় তখন মহানবী (সা.) বলেন, দেখো! আমি সত্য বলছি, আমি মহান আল্লাহ্‌র রসূল এবং আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছি। এই কথাটুকু বলতেই তারা সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে যায় এবং এক দুষ্ট বলে উঠে, تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمَ অর্থাৎ নাঊযুবিল্লাহ্, তাঁর (সা.) জন্য ধ্বংস কামনা করে কথা বলে। তিনি (আ.) বলেন, পরিতাপ! যে বিষয়টি তাদের পরিত্রাণ ও কল্যাণের জন্য ছিল সেটিকেই অপরিণামদর্শী এ জাতি মন্দ মনে করে আর বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়। এখন এর বিপরীতে মূসার জাতিকে দেখো। বনী ইসরাঈলরা কঠোর হৃদয়ের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-এর তবলীগ করতেই তারা তাকে মেনে নেয়। কিন্তু অপরদিকে (একই) জাতি মূসা (আ.)-এর চেয়েও উত্তম সত্তাকে মানতে পারে নি। হযরত মূসা (আ.)-এর জাতি সম্পর্কে আরও বলতে গিয়ে তিনি (আ.) উদাহরণ দেন যে, তারা হযরত মূসা (আ.)-কে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারে নি যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর চেয়েও উত্তম নবী ছিলেন, বরং বিরোধিতা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। ফলে মহানবী (সা.)-এর জন্য সমস্যার সূচনা হয়ে যায়। প্রতিদিনই তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করা হতে থাকে আর এ সময়টা এত দীর্ঘ হয়ে যায় যে, ১৩ বছর পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। ১৩ বছর কম সময় নয়। এ সময়ে মহানবী (সা.) যে পরিমাণ কষ্ট ভোগ করেন তা বর্ণনা করা সহজ নয়। দুঃখকষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে জাতির পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি করা নি, অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্যধারণ ও অবিচলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিতেন। একদিকে দুঃখকষ্ট দেয়া হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, ধৈর্য ধরো এবং অবিচল থাকো। এটিই হলো ধৈর্যের প্রকৃত অর্থ। আর বারবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল যে, পূর্ববর্তী নবীরা যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন তদ্রূপ তুমিও ধৈর্যধারণ করো। মহানবী (সা.) ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা হয়ে এসব কষ্ট সহ্য করেন এবং তবলীগের ক্ষেত্রে শৈথল্য প্রদর্শন করেননি বরং সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। আর বাস্তবতা হলো, মহানবী (সা.)-এর ধৈর্য পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় ছিল না, কারণ তারা তো নির্দিষ্ট জাতির প্রতি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই তাদের দুঃখকষ্টও ততটাই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এর বিপরীতে মহানবী (সা.)-এর ধৈর্য ছিল অনেক

বেশি। কেননা সর্বপ্রথম তাঁর স্বজাতিই তাঁর বিরোধী হয়ে গিয়েছিল এবং কষ্ট দিতে উঠেপড়ে লেগেছিল, উপরন্তু খ্রিষ্টানরাও শত্রু হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) কেবল আল্লাহ্‌র একজন বান্দা ও রসূল ছিলেন তখন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, কারণ তারা তো তাকে খোদা বানিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) এসে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করেন। এটি নিয়মের কথা যে, মানুষ যাকে খোদা বানিয়ে নেয় এবং নিজেদের উপাস্য জ্ঞান করে তাকে পরিত্যাগ করা এত সহজ বিষয় নয়, বরং তাকে পরিত্যাগ করা খুবই কঠিন হয়ে যায়। খ্রিষ্টানদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা যখন শুনে যে, মহানবী (সা.) তাদের কৃত্রিম খোদাকে মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন তখন তারা তাঁর (সা.) প্রাণের শত্রু হয়ে যায়। একদিকে স্বজাতি তাঁর শত্রু, কাফেররা শত্রু, প্রতিমা পূজারীরা শত্রু আর অপরদিকে খ্রিষ্টানরাও শত্রু হয়ে যায়। একইভাবে ইহুদিদের মাঝেও শিরকের বহু মতবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর ইহুদিদের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মাঝে শিরকের মতবাদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আর হযরত ঈসা (আ.)-কে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করত। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে মানতে প্রস্তুত ছিল না। তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারাও বিরোধিতা করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। মোটকথা ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুশরেক এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা সবাই বিরোধী হয়ে যায়। ইহুদিরা তো হযরত ঈসা (আ.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ প্রতারক এবং মিথ্যাবাদী বলত। এর বিপরীতে মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন যে, তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে নিজেরাই মিথ্যাবাদী হয়েছ (কেননা) তিনি খোদার মনোনীত এক নবী। এছাড়া তাদের বিরোধিতার আরো একটি বড় কারণ হলো তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও স্বল্পজ্ঞানের কারণে এটি মনে করেছিল যে, খাতামুল আম্বিয়া বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে হবেন, কেননা তওরাতে আল্লাহ্ তা'লার রীতি অনুযায়ী শেষ নবী সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা এমন ভাষায় করা হয়েছে যার ফলে তাদের মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে লেখা আছে, তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে (এক ব্যক্তি আসবেন)। তারা এর অর্থ ধরে নিয়েছিল, তিনি বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে হবেন অথচ এর অর্থ ছিল বনী ইসমাঈল। অতএব তারা যখন মহানবী (সা.)-এর দাবি শুনে যে, তিনি হলেন খাতামুল আম্বিয়া তখন তাদের সকল আশায় গুড়ে বালি হয়ে যায়। আর তওরাতের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর যে অর্থ তারা ধরে নিয়েছিল, (প্রকৃতপক্ষে) সেটিকে ভুল আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর ফলে তাদের হৃদয়ে আগুন লেগে যায় এবং তারা বিরোধিতায় উঠেপড়ে লাগে।

এক আহমদী কোনো এক গ্রাম থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে এসে উপস্থিত হয়। আর তার গ্রামে মৌলবিদের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করে দোয়ার অনুরোধ করে এবং বলে, আমার গ্রামে এক মৌলবি রয়েছে যে মাদ্রাসায় চাকরি করে। সে কট্টর বিরোধী এবং আমাকে অনেক কষ্ট দেয়। হুযূর দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন তাকে সেখান থেকে অন্যত্র বদলি করে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথা শুনে মুচকি হাসেন এবং তাকে এভাবে বুঝান যে, এই জামা'তে যেহেতু যোগ দিয়েছো তাই এই জামা'তের শিক্ষার ওপর আমল করো। যদি কষ্ট না হয় তাহলে পুণ্য কীভাবে লাভ হবে? মহানবী (সা.) মক্কায় তেরো বছর কষ্ট ভোগ করেছেন। তোমরা সে যুগের কষ্টের ধারণাও করতে পারবে না আর তোমাদেরকে সেই কষ্ট দেয়াও হয়নি, কিন্তু তিনি সাহাবীদেরকে ধৈর্যধারণেরই উপদেশ দিয়েছেন। অবশেষে সকল শত্রু বিনাশ হয়েছে। এমন যুগ আসন্ন যখন তোমরা এই দুষ্ট লোকদেরও দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ তা'লা ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে, এই পবিত্র

জামা'তকে তিনি পৃথিবীতে বিস্তৃতি দান করবেন। এখন তারা তোমাদেরকে সংখ্যালঘু দেখে কষ্ট দেয়, কিন্তু এই জামা'ত যখন সংখ্যাগুরু হয়ে যাবে তখন তারা নিজেরাই চুপ হয়ে যাবে। খোদা তা'লা চাইলে তারা তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিত না এবং দুঃখ-যাতনা প্রদানকারী সৃষ্টিও হতো না, কিন্তু এদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্যের শিক্ষা দিতে চান। কিছুকাল ধৈর্যধারণের পর দেখবে যে, কিছুই নেই। যে ব্যক্তি কষ্ট দেয়, হয় সে তওবা করে অথবা ধ্বংস হয়। অনেক এমন পত্রও আসে যে, পূর্বে আমরা গালি দিতাম আর মনে করতাম এতেই পুণ্য নিহিত, কিন্তু এখন আমরা তওবা করছি এবং বয়আত করছি। ধৈর্যধারণ করাও একটি ইবাদত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ধৈর্যধারণকারীরা অগণিত প্রতিদান লাভ করবে, অর্থাৎ তাদেরকে অজস্র ধারায় প্রতিদান দেয়া হবে। এই প্রতিদান কেবল ধৈর্যশীলদের জন্য। অন্য ইবাদতের জন্য খোদার এই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি নেই। এক ব্যক্তি যখন কারো সমর্থনে জীবন অতিবাহিত করে, তার যখন কোনো কষ্ট হয় তখন সমর্থনকারীর আত্মাভিমান জেগে ওঠে আর সে কষ্ট প্রদানকারীকে ধ্বংস করে দেয়। একইভাবে আমাদের জামা'ত আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনপুষ্ট আর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করলে ঈমান দৃঢ় হয়। ধৈর্যের ন্যায় আর কিছু নেই।

এরপর এক উপলক্ষ্যে কিছু মানুষ, যারা বয়আতের উদ্দেশ্যে কাদিয়ানে এসেছিল, তাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, জগৎপূজারীরা উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা উপকরণের মুখাপেক্ষী নন। কখনো তিনি চাইলে নিজ প্রিয়দের কাজ উপকরণ ছাড়াই করে দেন আর কখনো উপকরণের মাধ্যমে করেন। আবার কখনো এমনও হয় যে, বিদ্যমান উপকরণকে তিনি ধ্বংস করে দেন। বস্তুত নিজ কর্মকে পরিশুদ্ধ করো আর সবসময় আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করো। উদাসীনতা প্রদর্শন কোরো না। পলায়নপর শিকার যেভাবে সামান্য অলস হলে শিকারীর করায়ত্তে চলে আসে একইভাবে আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন ব্যক্তি শয়তানের শিকারে পরিণত হয়। তওবা করো, তওবাকে সবসময় জীবিত রাখো এবং কখনো মরতে দিও না। তওবা ছাড়া কখনো থাকবে না। সবসময় তরবায় রত থাকো, কেননা যে অঙ্গকে ব্যবহার করা হয় সেটিই কর্মক্ষম থাকে আর যেটিকে ব্যবহার করা হয় না সেটি স্থায়ীভাবে বিকল হয়ে যায়। একইভাবে তওবাকেও সচল রাখো যেন তা অকেজো না হয়ে যায়। যদি তোমরা সত্যিকার তওবা না করো তাহলে তা সেই বীজের ন্যায় হবে যা পাথরে বপন করা হয়। আর যদি তা সত্যিকার তওবা হয় তাহলে তা সেই বীজের মতো (হবে) যা উন্নত জমিতে বপন করা হয় আর যথাসময় ফল প্রদান করে। বর্তমানে এই তওবার পথে বহু সমস্যা রয়েছে। সেই নতুন বয়আতকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, এখন এখান থেকে ফিরে গিয়ে তোমাদেরকে অনেক কথা শুনতে হবে। মানুষ অনেক আজেবাজে কথা বলবে যে, তোমরা এক কুষ্ঠরোগী, কাফের ও দাজ্জালের হাতে বয়আত করেছ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গালি দিবে। যারা এরূপ করবে তাদের সামনে কখনো উত্তেজনা প্রদর্শন করবে না। আমি তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ধৈর্যের জন্য প্রেরিত হয়েছি। অতএব এ কথাগুলো আমাদের সবসময় স্মরণ রাখা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, তাই তাদের জন্য তোমাদের দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও হেদায়েত দিন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছেন তা হলো ধৈর্য। তাই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের মাঝেই আমাদের সাফল্য নিহিত।

তিনি (আ.) বলেন, আমাদের বিজয়ের অস্ত্র হচ্ছে তওবা-ইস্তেগফার। (প্রতিক্রিয়া দেখানো আমাদের বিজয়ের অস্ত্র নয় বরং আমাদের বিজয়ের অস্ত্র হলো তওবা-ইস্তেগফার,) ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন আর খোদা তা'লার শ্রেষ্ঠত্বকে দৃষ্টিপটে রাখা এবং পাঁচ বেলার নামাজ আদায় করা। নামায দোয়া কবুলিয়তের চাবিকাঠি। নামায যখন পড়বে তখন এতে দোয়া করো এবং আলস্য প্রদর্শন করো না। আর প্রত্যেক মন্দ থেকে, তা আল্লাহ্‌র অধিকারসংক্রান্ত হোক বা বান্দার অধিকারসংক্রান্ত– আত্মরক্ষা করো।

অতএব এগুলো হলো সেসব উপদেশ যা আমাদের সফলতা এবং উন্নতির ভিত্তি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশ অনুসারে আমরা যদি প্রকৃত অর্থে তওবা-ইস্তেগফার আর ধর্মীয় জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং পাঁচ বেলার নামাযের প্রতি মনোযোগী থাকি তাহলেই আমাদের সফলতা আসবে। বিরোধীরা যতটা গোলমাল ও শোরগোলের ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে আমাদেরকে ততটাই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অধিক বিনত হতে হবে। এটিই আমাদের সাফল্যের মূলমন্ত্র। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার আমাদেরকে এরই নসীহত করেছেন, কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখাতে নয়। আমাদের সফলতা সর্বাবস্থায় নির্ধারিত যেমনটি তিনি বলেছেন, ইনশাআল্লাহ্। তবে হ্যাঁ, এই কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রজ্ঞার সাথে নিজেদের দায়িত্বও আমাদেরকে পালন করে যেতে হবে। প্রজ্ঞা বা হিকমতের ভিত্তিতে অনেক কাজ হতে পারে। তাই প্রজ্ঞা অবলম্বন করে চলা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক আহমদী যদি নিজের এই দায়িত্বকে উপলব্ধি করে নেয় তাহলে বহু সমস্যার সমাধান আমাদের আচার-আচরণ আর দোয়ার মাধ্যমে হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ধৈর্য এবং দোয়া করার তৌফিক দিন আর তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এসব বিষয়ের ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)